এদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যা

অমল সেন

সহজ পাঠ প্রকাশনী

এদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যা

অমল সেন

প্রকাশক
অনিল বিশ্বাস

সহজপাঠ প্রকাশন
নীল রতন ধর রোড, যশোর।

প্রকাশকাল
৪ঠা মাঘ ১৪২০
১৭ই জানুয়ারী ২০১৪

প্রথম প্রকাশ
১৯৮২ ইং

মুদ্রণে
ছাপাঘর
নীল রতন ধর রোড, যশোর।

মূল্য : ১০ টাকা

মুখবন্ধ

কমরেড অমল সেনের অধিকাংশ লেখা একাধিকবার ছাপা হয়েছে। এখনও তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িকী এবং সকলনে রয়ে গেছে। পার্টির আদর্শগত পত্রিকায় রয়েছে অনেকগুলো লেখা। পার্টি কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক দলিলেও রয়েছে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সব লেখা। আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম এগিয়ে নেওয়ার জন্য কমরেড অমল সেনের প্রতিটি লেখাই গুরুত্বপূর্ণ। আগামী দিনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তাঁর লেখা পথদ্রষ্টা হিসাবে কাজ করবে। অমল সেনের এসব লেখা তাই যত্নের সাথে সংকলিত হওয়া দরকার।

তাঁর একাধিক লেখা যা পুস্তিকাকারে প্রকাশ পেয়েছে সেগুলো আবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। যেমন–'নড়াইলের তে-ভাগা আন্দোলনের সমীক্ষা' পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সাময়িকী ও সংকলনে। এমনকি ইতিহাসের লেখকরাও তাদের পুস্তকে 'তে-ভাগা আন্দোলনের সমীক্ষা'টি সংযোজিত করেছেন। তেমনি 'জনগণের বিকল্প শক্তি' একটি বহু আলোচিত ও বহু পঠিত পুস্তিকা। 'কমিউনিস্ট জীবন ও আচরণ রীতি প্রসঙ্গে' তাঁর একটি মৌলিক রচনা যা একাধিকবার ছাপা হয়েছে বিভিন্ন সংকলনে। 'সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যা' নামক রচনার দু'টি অংশ। একটি 'বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যা' এবং অপরটি 'এদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যা'। প্রথম অংশটি একাধিক সংকলনে মুদ্রিত হলেও 'এদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যা' দ্বিতীয় বার আর কোথাও ছাপা হয়েছে বলে জানা নেই। অথচ এটিই ছিল কমরেড সেনের সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যা নাম দিয়ে প্রবন্ধ দু'টি পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে দিনাজপুর জেলার রেজা প্রিন্টিং প্রেস থেকে। প্রকাশক মাহমুদুল হাসান মানিক।

মনে করি, বাংলাদেশে মেহনতি মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রামের বর্তমান সংকট ও সমাধানের উপায় খুঁজে পাওয়ার জন্য কমরেড অমল সেনের 'এদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যা' নামক রচনাটি আবারও দিগদর্শনের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

কমিউনিস্ট আন্দোলনে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের সাথে শ্রেণীসম্পর্ক ও রাষ্ট্রযন্ত্র সম্পর্কে বড় ধরনের ভ্রান্তি রয়েছে। এক্ষত্রে কমরেড অমল সেনের লেখা 'জনগণের বিকল্প শক্তি' নামক পুস্তিকার সাথে 'এদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যা' নামক রচনাটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। সে বিবেচনায় রচনাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করছি।

বিনীত

অনিল বিশ্বাস

এ দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যা প্রসঙ্গে

আমাদর দেশেও সমাজতন্ত্রমনা শক্তিগুলির এক ব্যাপক অংশের মধ্যে আজ বিভ্রান্তি, হতাশা এবং বিভেদের অবস্থা চলছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির মধ্যকার বিভ্রান্তিমূলক অবস্থা যে এক্ষেত্রে বেশ ভাল রকমেই ছায়াপাত করছে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এটাই সব নয়। আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির মধ্যকার বর্তমানে এই যে করুণ চেহারা তা সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দেশীয় উপাদানও কিছু কম নাই।

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলি বাদেও বন্ধুদের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন এবং অভিযোগ রয়েছে। এসবের মধ্যে এক ধরনের অভিযোগ রয়েছে যা এদেশের সমাজতান্ত্রিক কর্মীদের এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপন করে থাকেন। এই ধরনের অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ অনেক এবং বহুবিধ। আর এইসব অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগগুলির থেকে মৌলিক এবং প্রতিনিধি স্থানীয় হিসাবে কিছু সুনির্দিষ্ট করতে গেলে অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগকে এইভাবে হাজির করা যেতে পারে ঃ

'এই উপমহাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব বরাবরই ভুল পথ নিয়ে এসেছেন এবং বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কারণ, তারা সশস্ত্র বিপ্লব বিকাশের পথ নেন নি এবং কখনই মুখ্য দ্বন্দ্ব (প্রিন্‌সিপ্যাল কন্‌ট্রাডিকশন) নির্ধারণ করেন নি।'

'এই দেশে প্রকৃত অর্থে যাকে সর্বহারা শ্রেণী বলে, তা এখনও অস্তিত্বে আসে নি, এই যে ভেজাল শিল্পশ্রমিক তার সংখ্যাও নগণ্য। অথচ এখানেও সর্বহরা শ্রেণী এবং সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা থাকতে হবে এই একগুঁয়েমি জবরদস্তি, স্রেফ গোড়ামি প্রসুত ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা গোড়ামি থেকে এসেছে। 'মধ্যস্তরের' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে আমল দেওয়া হয় নি। আর এই বাস্তবতা অনুসারী এক 'অধনবাদী' বিকাশের কার্যক্রম সঠিক সময়ে এবং সকল অংশের উপলব্ধিতে আসছে না।'

পক্ষ-প্রতিপক্ষের এই সব অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগগুলির তাত্ত্বিক এবং বাস্তবানুগ বিচার বিশ্লেষণ হওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকারী। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে নয়। ঐ সব পক্ষ-প্রতিপক্ষের অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগগুলি বাদেও, এমন আরও কিছু প্রশ্ন এবং অভিযোগ রয়েছে যা পক্ষ-প্রতিপক্ষ নির্বিশেষে, আন্তরিক সমাজতন্ত্রমনা বন্ধুদের এক ব্যাপক অংশের উদ্যম ও আস্থাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এই শেষোক্ত ধরনের প্রশ্ন ও অভিযোগগুলির কয়েকটি সম্পর্কে কি সংক্ষিপ্ত আলোচনাই বর্তমানে নিবন্ধের বিষয়বস্তু ? এই ধরনের প্রশ্ন এবং অভিযোগগুলিকে বিন্যস্ত করতে গেলে দাঁড়ায়,–

(১) এই উপমহাদেশে, দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসা যাচ্ছে যে, নেতারা মাঝে মাঝেই বলে ওঠেন ঃ "ভুল হয়ে গেছে।" এর এক এক দফা ভুলের ফলে প্রচণ্ড যে ক্ষতি-লোকসান হয়েছে, সে প্রসঙ্গ বাদ দিলেও, এই মুহূর্তে যে কর্মপন্থার কথা বলা হচ্ছে, সেটাও যে ভুল নয় তার নিশ্চয়তা কী?

(২) সমাজতন্ত্র যারা চাইছেন, তাদের মধ্যেই এত বিভক্তি এবং দলাদলি শুধু নয়–নেতৃত্ব নিয়েই কামড়া-কামড়ি। এখানে এদের বা বামপন্থীদের ঐক্যও আর হবে না, ভবিষ্যৎও কিছু নেই।

(৩) চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা প্রভৃতি দেশ, আমাদের পরে শুরু করে কত আগে বিপ্লব করে ফেললো। আমাদের এখানে নিশ্চয়ই মৌলিক অক্ষমতার কোন দিক রয়েছে।

ভুল-ভ্রান্তি

এবার এই প্রশ্ন এবং অভিযোগগুলিকে কিছুটা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্ এবং ক্রমাগত ভুল করে চলা সম্পর্কিত প্রশ্নটিকে দিয়েই শুরু করা যেতে পারে।

প্রথমেই নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে যে, অভিযোগটি একটি নিষ্ঠুর সত্য। এই উপমহাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে এ পর্যন্ত যে ভুলগুলি, তাদের মধ্যে মোটা দাগের ভুলগুলিকে তালিকাবদ্ধ করলে দাঁড়ায়,–

(ক) তৃতীয় আন্তর্জাতিক, তখনকার দিনে, আমাদের দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 'জাতীয় যুক্তফ্রন্টের থিসিস' উপস্থিত করবার পূর্ব পর্যন্ত এই উপমহাদেশে 'প্রোলেটারিয়ান পাথ' লাইন চলছিল। এই লাইনে উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর যে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করবার ছিল তা ছিল অনুপস্থিত; তাই ঐ লাইন ছিল সংকীর্ণতাবাদের ত্রুটিযুক্ত এবং একপেশে।

(খ) 'জাতীয় যুক্তফ্রন্টের' এই লাইন ছিল শ্রমিকশ্রেণীর তার শত্রুশ্রেণীর সঙ্গে (জাতীয় বুর্জোয়া) এবং জনগণের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংগ্রাম ও ঐক্যের এক জটিল লাইন। এই জাতীয় যুক্তফ্রন্টের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ছোট-খাট আকারের বামপন্থী অথবা দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি পার্টি মাঝে মাঝে করেছে।

(গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের, জনযুদ্ধের পর্যায়টিতে এসে, যুদ্ধের মূল্যায়ন সঠিক থাকলেও, প্রয়োগের ক্ষেত্রে পার্টির কিছু কিছু সুবিধাবাদী পদক্ষেপ হয়েছে–এমন সমালোচনা রয়েছে।

(ঘ) সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রদায়িক দেশবিভাগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে একটি সময়ে কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের মধ্যে ঐক্যের জন্য আন্দোলনের (গান্ধী-জিন্না এক হও) পথ নেওয়া হয়। এটা ছিল সুবিধাবাদী বিচ্যুতি।

(ঙ) ১৯৪৮ সালে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে মারাত্মক রকমের বামপন্থী হঠকারী লাইন নেওয়া হয়।

(চ) (এরই উল্টা প্রতিক্রিয়া হিসাবে হয়তো) পরবর্তীকালে পূর্বপাকিস্তানের পার্টি দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির খাদে চলতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে দক্ষিণপন্থী সংশোনবাদের গহ্বরে পড়ে।

(ছ) রুশপন্থী এবং চীনপন্থী বলে কথিত হয়ে পার্টি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। 'চীনপন্থী' বলে কথিত অংশ কিছুদিন পর চারু মজুমদার প্রবর্তিত 'শ্রেণীশত্রু খতমের' এক মারাত্মক হঠকারী বিচ্যুতির লাইন গ্রহণ করে এবং সংগঠনগতভাবে বহুধাবিভক্ত হয়ে যায়।

(জ) আর 'রুশপন্থী' বলে কথিত অংশটি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর আত্মবিলোপের চরম পর্যায়ে চলে যায়।

ভুলের দুটি ধরন ঃ

এইসব ভুলগুলিকে বিশ্লেষণ করলে চরিত্রের দিক দিয়ে এদের দুটি কাতারে ফেলা চলে। এইগুলির মধ্যে-(১) এক ধরনের ভুল রয়েছে যেখানে বিপ্লবী শক্তি এবং পার্টির বিকাশের ক্ষেত্রে মৌলিক ভিত্তিমূলক যে কাজ, অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামের কাজকে বতিল করা হয়নি। ভুল যা হয়েছে, তা হল শ্রেণীসংগ্রামের রণকৌশলগত ক্ষেত্রে অথবা সঠিক প্রেক্ষিতে তাকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে অথবা জাতীয় প্রশ্নের সঙ্গে তাকে উপযুক্তভাবে সংশ্লিষ্ট করার ক্ষেত্রে। (২) দ্বিতীয় ধরনের যে ভুল তাতে বিভিন্ন রকমের গরম অথবা নবম শ্লোগানের আড়ালে শ্রেণীসংগ্রামের কাজকেই একেবারে শিকেয় তুলে দেওয়া হয়েছে।

প্রথমোক্ত ধরনের ভুলগুলির ক্ষেত্রে ক্ষতি-লোকসান হয়েছে ঠিকই। বিপ্লবী শক্তির যে পরিমাণে বিকাশ হতে পারতো তা হতে পারেনি, তাও ঠিক। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিপ্লবী শক্তির অগ্রগতি ও বিকাশ একেবারে স্তব্ধ হতে পারেনি। আর তাইতো দেখা যাবে যে, ভারত উপমহাদেশে, বৃটিশের প্রত্যক্ষ শাসন অবসান হবার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালে ভুলত্রুটি সত্ত্বেও, বিপ্লবী শক্তি গড়ে উঠেছে এবং তার বিকাশ অব্যাহত রয়েছে।

ঠিকই যে, এই বিপ্লবী শক্তি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ইতিহাস-নির্দিষ্টতার ভূমিকা পালনে সাফল্য দেখাতে পারেনি। ঠিকই যে, ভুলভ্রান্তি না হ'লে এবং আরও অনুকূল অবস্থার সুযোগ পেলে এই বিপ্লবী শক্তি যথেষ্ট শক্তিমান হয়ে নির্ধারক ভূমিকা নিতে পারতো। এতদসত্ত্বেও ভারত উপমহাদেশে বিপ্লবী শক্তি বৃটিশের প্রত্যক্ষ শাসন অবসানের সমসময়ে আদর্শ, সংগঠন এবং গণভিত্তির দিক দিয়ে খুব একটা তাচ্ছিল্য করার মত শক্তি ছিল না।

কিন্তু এই দ্বিতীয় ধরনের ভুলগুলি বিপ্লবী শক্তির ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। আর অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যে, বিভাগ-পরবর্তী পূর্ববাংলার এই অঞ্চলটিতে এই দ্বিতীয় ধরনের ভুলটি যেন কায়েমী মৌরসী পাট্টা করে নিয়েছে। দক্ষিণপন্থী লেজুড়বাদের তত্ত্বের আড়ালে অথবা অতিবিপ্লবী শ্লোগানের আবরণে শ্রেণীসংগ্রামের মৌলিক কাজটিকে বাতিল করে চলার বিচ্যুতি এখানে একটানা চলে আসছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের বিজয় এবং এই উপমহাদেশের বিপ্লবী সংগ্রামের অতীত ভাবমূর্তির টানে বন্যার স্রোতের মত ঝাঁকে ঝাঁকে তরুণ কর্মীরা বিপ্লব করবার মন নিয়ে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে পোড় খেয়ে বিপ্লবী কর্মী হয়ে ওঠার জায়গা পায়নি। আর তাই সুবিধাবাদ অথবা হঠকারিতার মধ্যবিত্ত ঝোঁকের জমিন এত উর্বর রয়ে গেছে।

যে ধরনের ভুল সবকিছু বিপ্লবী শক্তির বিকাশকে তছনছ করে দেয়, সেই ধরনের ভুল যখন একটার পর একটা বিভিন্ন দিক দিয়ে ঘটতে থাকে, তখন ঠিকই হতাশা সৃষ্টি হবার কারণ ঘটে। কিন্তু আমরা জানি যে, এই ধরনের ভুল–তা যে রকমের বহিরাবরণ নিয়েই আসুক, সেই সব ভুলের উৎস কিন্তু একটিই। এবং তা হচ্ছে– শ্রেণীসংগ্রামের মৌলিক কাজটিকে কোন না কোন অজুহাতে বাদ

দিয়ে রাখা। এই ধরণের ভুল হবে না-তার গ্যারান্টি হচ্ছে কার্যক্রমে শ্রেণীসংগ্রামের কাজকে মৌলিক কাজ হিসাবে রাখা। আর এখানটায় যদি আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ পরিষ্কার থাকে, তবে হতাশায় নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্ন আসে না; বরং কারো কোন কার্যক্রমের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের কাজটি মৌলিক কাজ হিসাবে গ্রহণ না করার যে কোন প্রবণতার বিরুদ্ধে সক্রিয় তৎপরতা সৃষ্টির অবস্থা হবে। অতীতের ভুলগুলিতে আমাদের অভিজ্ঞতা তিক্ত অভিজ্ঞতাও বটে। কিন্তু যে হতাশা আমাদের নিষ্ক্রিয় করে তোলে তা তখনই আসে, যখন বর্তমানের কর্মসূচীও যে ঐ ধরণের মারাত্মক ভুল বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে না-তার নিশ্চয়তা মনের মধ্যে খুঁজে না পাই। কিন্তু এই নিশ্চয়তার ক্ষেত্র রয়েছে এবং তা হচ্ছে কার্যক্রমের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের কাজকে মৌলিক কাজ হিসাবে গ্রহণ করার বিষয়টি।

[এখানে শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে আবারও উল্লেখ রাখতে চাই যে, শোষকশ্রেণীর কাউকে যে কোন প্রকারে আঘাত করাকেই শ্রেণী সংগ্রাম বলে না। শোষকশ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট শোষিত শ্রেণীর ব্যাপক অংশ যেখানে সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিচ্ছেন সেই সংগ্রামই শ্রেণীসংগ্রাম।]

যেখানে শ্রেণীসংগ্রামকে অন্যতম মৌলিক কাজ হিসাবে গ্রহণ করে অগ্রসর হওয়া হচ্ছে সেখানে কি কোনও প্রকার ভুলভ্রান্তি হবার অবকাশ থাকবে না? নিশ্চয়ই থাকবে। ইস্যু নির্বাচনে, সংগ্রামের ফরম নির্বাচনে, অন্য শ্রেণীর সংগে ঐক্য ও সংগ্রামের আপেক্ষিতা বিচারে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে শ্রেণীসংগ্রামকে সঠিক বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে, অন্যান্য সংগ্রামের সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামকে সঠিক সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে কৌশলগত বিচ্যুতি কখনও হবে না-এর গ্যারান্টি নেই। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে যদি কোথাও কোন বিচ্যুতি হয় তার জন্য লোকসান কিছু না কিছু হবেই; তবে সামগ্রিকভাবে, বিপ্লবী শক্তি বিকাশের অগ্রগতি স্তব্ধ হবে না। এতে সতর্ক হবার তাগিদ থাকে; হতাশ হবার ক্ষেত্র থাকে না।

দলাদলি ঃ

এবার আশা যাক দলাদলি প্রসঙ্গে। এই প্রসঙ্গে অভিযোগের ধরনটি হচ্ছে এই ধরনের-সমাজের আমূল পরিবর্তন এবং সমাজতন্ত্রের একই লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করে, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টির কথা বলে অসংখ্য দল; ক্রমাগত দল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো দল সৃষ্টি-এই চিত্র সত্যিই কিছু উৎসাহব্যঞ্জক নয়। যেন মনে হয় নেতাদের কাছে সমাজতন্ত্রের স্বার্থটা আজ আর বড় নয়, নিজের নিজের নেতৃত্বের কথাটাই বড়। আর সেইজন্যই এত দল। আজ কাজের মধ্যে হচ্ছে পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়ি।

খেয়ালে রাখা দরকার যে, অভিযোগটি সব ক্ষেত্রে নিছক কুৎসা প্রচার অথবা বিপ্লবী জীবন থেকে কেটে পড়ার মতলবের অজুহাত হিসাবেই শুধু আসে না। অনেক ক্ষেত্রে আন্তরিক দুঃখবোধ এবং ক্ষোভ থেকেও থাকে। আবার আমাদের দেশের নির্দিষ্ট বাস্তবে এই আত্মতুষ্টিও সঠিক নয় যে, দলাদলি থাকে, কিন্তু তাতে বিপ্লব আটকায় না। সুতরাং বিষয়টিকে একটু তলিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

এই সব নেতাদের দল ভাগাভাগির সময়ে অনুগামী কর্মীদের নিশ্চিতই বিপ্লবী তত্ত্বভিত্তিক যুক্তি দিতে হয়। এবং যে নেতার নেতৃত্বে দল ভাগ হয়ে স্বতন্ত্র দল গঠিত হল, দল গঠিত হবার পর সেই নেতা ব্যক্তিটি যদি নাও থাকেন তবু আপনা আপনি দল দু'টি জোড়া লেগে যাবে না। যতগুলি দল রয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই কথা হল, "সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বভিত্তিক না হলে সে দল বিপ্লব করতে পারে না।" এবং প্রত্যেক দলেরই যুক্তি হল—"এরই জন্য স্বতন্ত্র দল করতে হয়েছে।" এখন এদের কোন্ দলটি যে সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বভিত্তিক তা কে বলে দেবে? আমরা জানি, তত্ত্বের সঠিকতা যাচাই হয় প্রয়োগে যেয়ে। বিপ্লব শ্রেণীসংগ্রামের চূড়ান্তরূপ। বিপ্লবী তত্ত্বের সঠিকতা যাঁচাই হবে শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। শ্রমজীবী জনগণের জীবন সংগ্রাম হতে সম্পর্কহীন থেকে, শ্রেণীসংগ্রামের কাজে হাত না লাগিয়ে শুধু তত্ত্বের কুটতর্ক মতবিরোধ মিটাতে পারে না। আর প্রত্যক্ষ শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত থাকলে মতবিরোধ নিয়েও একত্রে কাজ করতে হয় এবং এই কাজের মধ্য দিয়ে ঐক্যমতে পৌছানো সম্ভব হয়। আর এই শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে লিপ্ত নই বলেই মতবিরোধ অবধারিতভাবে দল ভাঙ্গাভাঙ্গির পরিণতি লাভ করে।

যে সব দল মার্কসবাদের অনুসারী বলে দাবী করেন, তাদের রাজনৈতিক লাইনের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে যত অমিল থাকুক না কেন, এটাতো তারা সবাই মানবেন যে, শ্রমজীবী জনগণের হাতে ক্ষমতা আনতে হবে। সুতরাং জনগণের সচেতন নিজস্ব এক পাল্টা শক্তি যাতে বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে, এটাতো, যার যে লাইনই থাকুক না কেন, সবার পক্ষেই একটি প্রশ্নাতীত প্রাথমিক কাজ হতে হয়। আর জনগণের এই নিজস্ব, সচেতন পাল্টা শক্তি, শ্রমিক শ্রেণীর বিশিষ্ট ধারায় পরিচালিত, বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার শ্রমজীবী মানুষের জীবন জীবিকার সংগ্রামের পথেই মাত্র বিকাশ লাভ করতে পারে। কিন্তু নিজের নিজের দলের অনুসারী লোক জোটানোর মতলবের এক যান্ত্রিক কৌশল দিয়ে যদি শ্রেণীসংগ্রাম করতে যাওয়া হয়, তবে বিভিন্ন দল এক সাথে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীসংগ্রামে হাত লাগাতে পারবেন না। পরস্পর ল্যাং মারামারি করে, প্রত্যেক দল নিজ নিজ দলের অনুগামীত্বে লোক জোটানোকেই মুখ্য করে তুলবেন, নির্দিষ্ট শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থ মাঠে মারা পড়বে। অথচ সংশ্লিষ্ট জনগণের নিজস্ব, সচেতন পাল্টা শক্তি ও নেতৃত্ব যদি বিকশিত হয়ে ওঠে, তবে তাইতো বিপ্লবী শক্তির বিকাশ। আর যদি কারো এই আত্মবিশ্বাসে দুর্বলতা না থাকে যে, তার দল এবং তার লাইন সঠিক, তবে সে ক্ষেত্রে তার দুশ্চিন্তার ক্ষেত্র কোথায়? যান্ত্রিকভাবে সংশিষ্ট শ্রমজীবী মানুষকে দলে টানাটানি করার ব্যস্ততার যুক্তি কি? শ্রেণীসংগ্রামের এই সঠিক লক্ষ্য সম্পর্কে উপলব্ধির গোজামিল থাকছে বলেই শ্রেণীসংগ্রামের বিভিন্ন দল একত্রে হাত লাগাতে পারি না।

আদতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কিত অবৈপ্লবিক ও অবৈজ্ঞানিক ধারনা থাকছে বলেই ঐক্যের সঠিক যে জমিন, সেই জমিনের উপর আমরা যেয়ে দাঁড়াতে পারছি না। পার্টির নেতৃত্বে জনগণের একনায়কত্বের রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যাপারটিকে আমরা অতি সরলীকরণ করে কার্যতঃ পার্টি একনায়কত্বের রাজনৈতিক ক্ষমতার বুর্জোয়া বিভ্রান্তির মধ্যে ঢুকে পড়ি। আর তাই কখনও জনগণের শ্রেণীসংগ্রামের ব্যাপারটিকে বাতিল করে বিপ্লব করতে যাই, আর কখনও বা সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বের অছিলায় নিজ নিজ দলের অনুগামী জোটাতে শ্রেণীসংগ্রাম করতে যাই।

যাতে জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রয়োগের শক্তি বিকশিত হয়ে ওঠে, এই লক্ষ্যে দৃঢ় থাকলে, শ্রমজীবী মানুষের পাল্টা শক্তি বিকশিত হবার উপযোগী কাজের ধারায় শ্রেণীসংগ্রামের কাজে একত্রে হাত লাগানো যায়। ঐক্যের সঠিক জমিনটির উপর যেয়ে দাঁড়ান যায়।

বামপন্থী ঐক্য ঃ

"বামপন্থীদের ঐক্য" আজ খুবই জনপ্রিয় শ্লোগান। কিন্তু এই প্রশ্ন কি নিজেদের কাছে করেছি যে, বাপন্থীদের ঐক্য কেন চাই? ঐক্য কোন লক্ষ্য হতে পারে না। ঐক্য চাই কোন একটি কাজের জন্য। যারা আন্তরিকভাবে বামপন্থীদের ঐক্য চাইছেন, তাদের অনেকের চিন্তার মধ্যে আছে যে, "জনগণ বর্তমান সরকারের প্রতি বিরূপ, কিন্তু তারা কোন বিকল্প শক্তি দেখছেন না বলে চুপ করে সয়ে যাচ্ছেন। এখন বামপন্থীরা একত্র হলেই যে পার্টি হবে, তা বহু সৎকর্মী সমন্বিত একটি বড় পার্টি হয়ে দাড়াঁবে। জনগণের মধ্যে এই আস্থা সৃষ্টি হবে যে, এই পার্টি বর্তমান সরকারী পার্টির একটি ক্ষমতাবান পাল্টা পার্টি। তখন ব্যাপক জনগণ এই পার্টির পিছনে এসে দাঁড়াবেন এবং বামপন্থী শক্তির রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে।" কিন্তু ক্ষমতা দখল করার এই পন্থা হচ্ছে শোষকশ্রেণীর পন্থা। শোষক শ্রেণীর এক গোষ্ঠি এই পন্থাতেই অন্য গোষ্ঠির হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে। এই পন্থায় জনগণের হাতে ক্ষমতা আসতে পারে না।

বামপন্থী কাকে বলে?

আদতে প্রশ্নটি একেবারে গোড়াতেই করতে হয়। বামপন্থী কাকে বলে? কে কী দাবী করছেন অথবা কার ঘোষণা ও কর্মসূচীতে কী আছে তা দিয়েই কি? এটি মাপকাঠি হলে মুস্কিলটা বুঝতে পারছেন! সুতরাং কে কী বলছেন তা নয়, কে কী করছেন তা দিয়েই পারছেন! সুতরাং কে কী বলছেন তা নয়, কে কি করছেন তা দিয়েই ঠিক করতে হবে কে বামপন্থী। শ্রমজীবী জনগণের জীবন–জীবিকার সংগ্রামের সঙ্গে থেকে জনগণের নিজস্ব বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি বিকশিত করার পথে ঐসব শ্রেণীসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজ যিনি করছেন তিনিই বামপন্থী। এই ধরনের সংগ্রামের পক্ষে যারা সাংস্কৃতিক সংগ্রাম অথবা গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রাম করেন তারাও বামপন্থী। বামপন্থীর এই সংজ্ঞা গ্রহণ করতে আমাদের অস্বস্তি বোধ সহজেই অনুমান করা যায় না। কারণ ঐ নির্দিষ্ট কাজটি আমরা প্রায় কেউই করছি না। সুতরাং বামপন্থী ঐক্যটা সমস্যা নয়, প্রয়োজন যেটা তা হচ্ছে আমাদের কাজে কর্মে বামপন্থী হওয়া। বামপন্থী হওয়ার কাজটি শুরু করলেই দেখা যাবে বামপন্থীর ঐক্য হয়ে বসে আছে।

এই প্রসঙ্গে একটি রূঢ় বাস্তবতাকে আমাদের স্বীকার করে নেওয়া দরকার। মার্কসবাদ ভিত্তিক শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি থাকে বলে তার একটি বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট মৌলিক চরিত্র, ভূমিকা এবং কার্যক্রম থাকতে হয়; তাকে গড়ে উঠতে হয় নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে; পার্টির মার্কসবাদী বিপ্লবী চরিত্রটিকে অক্ষুণ্ন রাখতে হয় প্রতিনিয়ত সঠিক ক্রিয়াকলাপের কার্যক্রমে লিপ্ত থেকে। সাময়িকভাবে কোন মারাত্মক ভ্রান্ত লাইন গ্রহণ করলে, তৎক্ষণাৎ একটি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি তার মৌলিক চারিত্রটি হারায় না এটা ঠিক, কিন্তু বছরের পর বছর যুগের পর যুগ ধরে মারত্মক ভ্রান্ত

কার্যক্রমে লিপ্ত থাকলে, ঐ দলটি তার কমিউনিস্ট চরিত্রটি খুইয়ে ফেলবেই! আবার নিষ্ঠার সঙ্গে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করেছেন, এমন কিছু কর্মী একটি রণনীতি ও রণকৌশলগত দলিল গ্রহণ করে একটি সংস্থা গঠন করলেই সেই সংস্থাটি তৎক্ষণাৎ একটি শ্রমিক বিপ্লবী পার্টি হয়ে ওঠে না। এই পর্য্যায়ে একে মার্কসবাদের আদর্শ গ্রহণকারী কর্মিদের একটি সংস্থা বা গ্রুপ বলা যেতে পারে। এইসব কর্মী যখন শোষিত শ্রেণীগুলির শ্রেণীসংগ্রামে শরীক হতে থাকেন, শ্রেণীসংগ্রামগুলির নেতৃত্বশীল অংশ হয়ে উঠতে থাকেন, শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে পোড় খেয়ে কর্মীরাও নিজেদেরকে আমূল পরিবর্তিত করে তুলতে পারেন, তখন সেই পর্যায়ে এসেই মাত্র সংস্থাটি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির চরিত্র পেতে পারেন, শ্রেণীসংগ্রামের বিপ্লবী নেতৃত্বের পার্টি হয়ে উঠতে পারেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখানে প্রায় একাধিক দশককাল ধরে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নামের যে সংস্থা বা সংস্থাগুলি তা মূলত কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণকারী কর্মীদের সংস্থা পর্যায়েই রয়ে থেকেছে। তাইতো, এখানে দল ভাগাভাগি হতে গেলে শ্রেণীসংগ্রামের নেতৃত্বশীল অংশকে ভাগ হতে হয় নি। তাইতো রাতারাতি দল ভাঙ্গা আর দল গড়ার ম্যাজিক দেখানো সম্ভব হয়।

আর একবার ভাগাভাগি করে কোনক্রমে এই ধরনের তথাকথিত একটি পার্টি করে ফেলতে পারলে কর্মীরা আর যাবেন কোথায়? তারা বিপ্লবী কর্মী না? পার্টি আনুগত্যে বিপ্লবী কর্মীদের কাছে সর্ব প্রধান অনুগত্য নয়? আর কথাটিতো সত্যিই উড়িয়ে দেবার মতও নয়। **কিন্তু কমিউনিস্ট কর্মীর মৌলিক আনুগত্যটি হচ্ছে শ্রমজীবী জনগণ, সর্বহারা শ্রেণী এবং বিপ্লবের প্রতি সচেতন আনুগত্য। এই আনুগত্য থেকেই আসে পার্টি আনুগত্য। এই মৌলিক আনুগত্যের ভিতটি না থাকলে পার্টি আনুগত্য হয়ে দাঁড়ায় অন্ধ সংস্কারমূলক আনুগত্য, 'ক্ল্যান আনুগত্যের' সমপর্যায় ভূক্ত।** আর এই ধরনের 'পার্টি আনুগত্যের' দড়িতে কর্মীদের হাল্‌সী গেঁথে নিয়ে, বিপ্লবের নামে দিনের পর দিন, দলবাজী, আর দলীয় কোন্দল চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

সব কিছু সত্বেও আজ আশান্বিত হবার ক্ষেত্র বিকশিত হতে চলেছে। বাংলাদেশ হবার পর আজ আর বেশী দিন পর্যন্ত শ্রেণীসংগ্রামের মূল ধারাকে ধামাচাপা রেখে, স্বাধীনতা প্রতিরক্ষা, গণতন্ত্র প্রভৃতি সাধারণ শ্লোগানে বাজার গরম করার রাজনীতি বাজারে কাটতি হবার অবস্থা থাকছে না। প্রচেষ্টা একেবারে থেমে গেছে, তা নয়। "বাকশাল বিরোধী হওয়ার তলোয়ার ঘোরানোর রাজনীতি" অথবা "অধনবাদী পন্থায়" সমাজতন্ত্রে পৌছাবার রাজনীতির কানাগলির মধ্যে ঢুকেও হাক–ডাক যে একেবারে বন্ধ করছে– তা নয়। কিন্তু সামনে এগুবার পথ যে নেই এটা ক্রমাগত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সবচেয়ে বড় কথা যে, পুরানো কায়দায় ক্ষমতার পরিবর্তনের মধ্যে জনগণ আর আশার সন্ধান পাচ্ছে না। এই পথে জনগণের সাড়া মিলছে না। অন্যদিকে **"শাসকদলে মধ্যে প্রগতিশীল অংশ আবিষ্কার" এবং তার সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেষি করে সমাজের বিপ্লবী পরিবর্তন করে ফেলা"** "হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে সশস্ত্র বিপ্লব করতে লেগে যাওয়া" প্রভৃতি সস্তায় কিস্তিমাতের চমকদারি পাঁয়তারায় আজ আর হাত-তালি পাওয়া যাচ্ছে না। কানাগলির বাধার দেওয়াল মাথায় ঠোক্কর দিয়ে ভাবনা-চিন্তায় বাধ্য করছে। বাস্তব আজ শ্রেণীসংগ্রামের পথ ছাড়া অন্য পথে এগুবার রাস্তা বন্ধ করে আনছে, ভরসার ক্ষেত্রটি এখানেই।

ওরা পারল-আমরা পারলাম না ঃ

এবার তৃতীয় অভিযোগটির বিচার-বিশ্লেষণে আসা যাক। "ওরা পারলো-আমরা পারলাম না।" – এটা তো বাস্তব ঘটনা। কথাটি যদি শুধু ক্ষোভ থেকে আসতো, কথা ছিল না। এই ক্ষোভ থেকে সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব আমাদের মধ্যে তীব্র আত্মদংশন সৃষ্টি করতো, মরিয়া হয়ে কাজে লাগতে অনুপ্রাণিত করতো। কিন্তু কথাটি হামেশা আসে অভিযোগ থেকে। আর এই অভিযোগের যে ইঙ্গিত তা হচ্ছে এই যে, এই উপমহাদেশে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপে গোড়া থেকেই মৌলিক কোন গলদ রয়ে গেছে। সফল বিপ্লবের জন্য যে যোগ্যতা লাগে, এখানে বিপ্লবী সংগ্রামেও তার নেতৃত্বের যোগ্যতার মান তার ধারে-কাছেও যেতে পারেনি, পারবেও না। আবার কোন কোন মহল একথাও বলেন যে, আমাদের এখানে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের অতীত অপদার্থতার অতীত শুধু নয়, বিশ্বসঘাতকতার অতীতও।

যোগ্যতার মানের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা, নির্বিশেষ (এ্যাবস্ট্রাক্ট) ভাবে আলোচনা করতে গেলে ফলপ্রসূ হয় না। নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ধরেই তা করা উচিত। এবং এ ব্যাপারে চীনের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ সবদিক দিয়েই উপযোগী হতে পারে। এক্ষেত্রে অভিযোগটিকে সুনির্দিষ্ট করলে দাঁড়াচ্ছে–"প্রায় সম-সময়কালে চীন এবং ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির জন্ম হ'ল। চীনের পার্টির নেতৃত্বে সেই ১৯৪৯ সালে ক্ষমতা দখল হ'ল; কিন্তু একানে আমরা এখনও কোথায় পড়ে রয়েছি।"

চীন বনাম ভারত ঃ

যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচারের ব্যাপারে দু'টো দিককে নির্দিষ্ট করে নেওয়া যেতে পারে।

ক) বিপ্লবী শক্তিকে যথেষ্ট পর্যায়ে বিকশিত করে তোলার দিক দিয়ে যোগ্যতা;

খ) বিপ্লবী সুযোগকে সফলভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা।

বিপ্লবী শক্তিকে বিকশিত করে তুলবার সংগ্রামের ক্ষেত্রে যোগ্যতার তুলনামূলক বিচারের প্রশ্ন এলে প্রথমে এ দু'টি দেশের বাস্তব অবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে।

(১) চীন ছিল একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশ, ভারত ছিল সবচাইতে জাদরেল বৃটিশ সাম্রজ্যবাদের এক প্রত্যক্ষ শাসনাধীন উপনিবেশ।

(২) চীনে সংগঠিত কেন্দ্রীয় শাসন প্রায় ছিল না বলা চলে। বিভিন্ন সাম্রজ্যবাদী শক্তির মধ্যে ঘাত–প্রতিঘাতের লীলাভুমি ছিল চীন। এরই ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন অঞ্চলের সমরনায়ক শাসন কর্তাদের (ওয়ার লর্ডস্) পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ এবং সামরিক সংঘর্ষ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অপর পক্ষে ভারতে বৃটিশের সুসংবদ্ধ শাসনযন্ত্র এবং দৃঢ় সংগঠিত কেন্দ্র ছিল। বৃটিশের প্রত্যক্ষ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে সহজে জাগ্রত যে মনোভাব তার প্রতিনিধিত্বকারী এক ভাবমূর্তি ভারতের বুর্জোয়ারা সহজে দখল করার সুযোগ পেয়েছিল।

সহজেই জাতীয় নেতার পোক্ত আসন দখল করেছিল ভারতের বুর্জোয়ারা। চীনের বুর্জোয়াদের সেই তুলনায় সুযোগ ছিল কম। চীনের বুর্জোয়াদের হাত থেকে জাতীয় মুক্তির নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়া চীনের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে যত সহজ ছিল, ভারতের বুর্জোয়াদের হাত থেকে জাতীয় মুক্তির নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়া ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে তত সহজ ছিল না।

(৩) রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সারা দুনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা দেয়। দীর্ঘ সহ-সীমান্ত থাকার সুযোগে ভারতের তুলনায় চীন এদিক দিয়ে প্রত্যক্ষ সুযোগ পেয়েছে। ভারতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মার্কসবাদী সাহিত্য এবং রাশিয়ার প্রকৃত সংবাদ চোরাপথে ইংল্যান্ড ঘুরে ছিটে ফোঁটা আসতে পারতো।

(৪) সানইয়াৎ- সেন এর নেতৃত্বে চীনে যখন জাতীয় সরকার গঠিত হয় তখন কমিউনিস্ট পার্টিকে তার শরীক করে নেওয়া হয়। এই সময়ে কমিউনিস্টরা সরকারী বাহিনীর মাধ্যই ৮ম রুট আর্মি ও ৪র্থ আর্মি এই দুইটি আর্মি গঠন করার সুযোগ পায় উত্তর অভিযানের সময়। অথচ এই সময়ে চীনের কমিউনিস্টদের খুব বেশী কিছু গণভিত্তি গড়ে ওঠে নি। সানইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনের বুর্জোয়ারা তখন সোভিয়েত শক্তিকে তথা কমিউনিস্ট শক্তিকে মূল্যবান বন্ধুশক্তি হিসাবে মূল্যায়ন করেছে। আর সেই জন্যই চীনের পার্টিকে সরকারের শরীক করে নিয়েছে। কিন্তু এরই সমসাময়িক কালে ভারতের বুর্জোয়াদের ভারতের কমিউনিস্ট শক্তির প্রতি মনোভাব খুবই সতর্কতামূলক।

(৫) সানইয়াৎ- সেনের নেতৃত্বে চীনের বুর্জোয়া শক্তি স্বাধীনতা সংহত করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের (বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার বিভিন্ন অঞ্চলের সমরনায়ক শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান) পন্থা গ্রহণ করে। ভারতের বুর্জোয়া নেতৃত্ব সংগ্রামের সশস্ত্র ধরনকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেয় নি। যে সংগ্রামের ধরন সশস্ত্র তাতে বুর্জোয়া নেতৃত্বের চাইতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের পক্ষে অগ্রগামী হবার সুবিধা তুলনামূলকভাবে বেশী থাকে।

(৬) চীনে স্বাধীনতা সংগ্রামটি প্রত্যক্ষভাবে সামনে না থাকায়, চিয়াং কাইশেখের সরকারের আমলে গৃহযুদ্ধের সময়, চীনের পার্টি শ্রেণীসংগ্রামের পথে পাল্টা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেল। এ সব শ্রেণীসংগ্রামগুলির বিরুদ্ধে চিয়াং সরকার হিংস্র আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু ঐ আক্রমণকে প্রধানত হতে হয়েছে সামরিক। চিয়াং শাসক গোষ্ঠী ঐ সব শ্রেণীসংগ্রামগুলির বিরুদ্ধে ভাবাদর্শগত সংগ্রাম যুৎসই ভাবে চালাতে পারেনি।

ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে শ্রেণীসংগ্রাম করতে হয়েছে যখন বুর্জোয়ারা জাতীয় স্বাধীনতায় এক প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেতৃত্বের অবস্থানটি পোক্তভাবে দখল রেখেছে। আর শ্রেণীসংগ্রামগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামের 'বাদহাটা' শ্রেণীসংগ্রামলি জাতীয় ঐক্যকে নষ্ট করছে অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষতি করছে এই ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা ভারতের বুর্জোয়ারা সুবিধাজনক ভাবে করতে পেরেছে।

(৭) চীনে জাপ বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি জাতীয় প্রতিরোধের যোগ্য নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পেল, জাপানের আত্মসমর্পণের ফলে জাপদখলীকৃত গুরুত্বপূর্ণ মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল পার্টির হাতে এলো; আর এলো, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বিশ্বস্ত নেতা হিসাবে জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা। এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে চীনের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনগণ সহজেই চূড়ান্ত ভাবে জয় করে নিল রাজনৈতিক ক্ষমতা। চীনে এই জাপআক্রমণ হবার সময়ে চীনের পার্টির প্রতিরোধের সামরিক শক্তির ভিতও অবশ্য বেশ কিছু গড়ে উঠতে পেরেছিল। তার কারণ ৮ম রুট আর্মিও ৪র্থ আর্মি পার্টির পক্ষে ছিল এবং চিয়াংকাইশেকের সরকারের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পার্টি নেতৃত্বে সশস্ত্র প্রতিরোধের শক্তি সৃষ্টি হচ্ছিল। চীনের পার্টির এসব সুবিধাজনক অবস্থান নিয়ে জাপবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করেছিল। এই ধরনের প্রাথমিক সামরিক সুবিধা ঐ সময়ে ভারতের পার্টির ছিল না এটা ঠিক। তৎসত্ত্বেও জাপসৈন্য ভারতের মধ্যে ঢুকে অগ্রসর হতে থাকলে পার্টি তার জাপ প্রতিরোধের গৃহীত নীতিকে কার্যকর করতে একেবারেই শক্তিহীন ছিল না। যে গণভিত্তি এবং সাংগঠনিক শক্তি তখন পার্টির ছিল তার ভিত্তিতে, এটা বলা খুব একটা শূন্যগর্ভ আস্ফালন হবে না যে, পার্টি অতি দ্রুত জাপ-বিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারতো। এক্ষেত্রে ভারতীয় বুর্জোয়াদের তরফ থেকে রাজনৈতিক আক্রমণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বপ্রকার বাধা–সব কিছুর সঙ্গে সংগ্রাম করেই পার্টিকে জাপ-বিরোধী জনযুদ্ধ গড়ে তুলতে হত তা ঠিক। কিন্তু এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পার্টি তা করতে পারতো যদি জাপ–সৈন্য ভারত ওভাররান করতো, পার্টির নেতৃত্বে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম শক্তিশালী হয়ে উঠলে এবং বিশ্বপরিসরে অক্ষশক্তির পরাজয়ের ফলশ্রুতিতে জাপ-সৈন্য আত্মসমর্পণ করলে ভারতের পার্টি যে শক্তি ও অবস্থান নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারতো–তা হয়ে উঠতো এক নিয়ামক শক্তি। এবং সেক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্য চীনের ভাগ্য থেকে স্বতন্ত্র থাকতো না। ভারতের দ্বারপ্রান্তে এসে জাপ-সৈন্যের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গেল। জাপ-সৈন্য ভারতে ওভার-রান করলে এবং প্রতিরোধ যুদ্ধে, ভারতের জনগণের জীবনে দুর্দশা ও মৃত্যুর বিভীষিকা নামতো ঠিকই। কিন্তু জাপ আক্রমণ না হলেও ভারতের জনগণ যুদ্ধের ফলজনিত মৃত্যু ও দুর্দশার বিভীষিকা থেকে কিছু একটা অব্যাহতি পেতে পারেনি। চীনে জাপ-সৈন্য ওভার-রান করেছে, ভারতে করেনি। এটা আন্তর্জাতিক ঘটনা, এদেশ-ওদেশের হেরফের। আর এই হেরফের দু'টি দেশের ভবিষ্যতের হেরফের ঘটাতে এক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ অবদান সৃষ্টি করলো। কমরেড লেনিন কোন দেশের সফল বিপ্লবের পূর্বশর্তগুলির উল্লেখ করতে যেয়ে এই জন্যই সুযোগপূর্ণ আন্তর্জাতিক অবস্থার বিষয়টি এত গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন। শুধু চীনের ক্ষেত্রেই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফ্যাসিস্ট অক্ষশক্তি যেসব দেশে ওভার-রান করেছে এবং এই সব দেশের সেখানেই ফ্যাসিস্ট বিরোধী জনযুদ্ধের সৃষ্টি হতে পেরেছে তার প্রতিক্ষেত্রেই দেখা যাবে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির শক্তিমান হয়ে উঠার ঘটনা, দেখা যাবে শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিজয় লাভের ক্ষেত্রে অগ্রগতির ঘটনা।

যোগ্যতা বিচারের দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হচ্ছে বিপ্লবী সুযোগকে সার্থকভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা। এ ব্যাপারে কোন কোন মহলের অভিযোগ রয়েছে যে ১৯৪৫-৪৬-৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশে ঐ গণসংগ্রামের জোয়ারকে সার্থক সশস্ত্র বিপ্লবী ক্ষমতা দখলের পরিণতিতে নিয়ে নেওয়া যেত ; তদানিন্তন কমিউনিস্ট নেতৃত্ব বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

অনেক সমালোচনা থাকলেও, এই অভিযোগটি অসঙ্গতই শুধু নয়, অভিযোগটির মধ্য দিয়ে অভিযোগকারীদের মধ্যকার হঠকারী বিভ্রান্তিই বরং ফুটে বেরোয়। সাম্রাজ্যবাদী প্রত্যক্ষ শাসনের উপনিবেশে স্বাধীনতার প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে কোন বিপ্লবী ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা কার্যকরী হতে পারে না। আর ঐ সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষ শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিচ্ছে এই ঘোষণা করে বসে আছে। জনগণের কাছে স্বাধীনতার ব্যাপারে বৃটিশ প্রশাসনের বিরোধী সংগ্রামের আর কোন প্রশ্নই ছিল না। কংগ্রেস ও লীগ নেতারা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে স্বাধীনতা নিয়ে নিয়েই ফেলে–জনগণের কাছে ব্যাপারটা এইভাবেই তখন রয়েছে। যে কোন সময়ে এই ক্ষমতা হস্তান্তর করে জনগণের মধ্যে ব্যাপক এবং গভীর রাজনৈতিক বিভ্রান্তি সৃষ্টির মারফৎ তখন যে কোন বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টাকে ব্যাপক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নস্যাৎ করে দেবার বন্দবস্ত তখন হয়েছে। '৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই তেলেঙ্গানা, ত্রিপুরা, নড়াইলের তে-ভাগা অঞ্চল প্রভৃতি সংগ্রামগুলি রাজনৈতিক বিভ্রান্তির গ্রাসে পড়ে মুহূর্তে কিভাবে চুপসে গেল–তার বাস্তব দৃষ্টান্ত এই সত্যটির তর্কাতীত প্রমাণ।

স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব বেশ কিছু আগ থেকেই যদি শ্রমিকশ্রেণীর করায়ত্ব থাকতো, তা হলে হয়তো ঘটনা অন্যরকম হতে পারতো। সে সমালোচনার ক্ষেত্র অন্য। বিপ্লবের সুযোগকে ব্যবহার করার যোগ্যতা প্রসঙ্গে এসেই সমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

চীনের সঙ্গে এই যে তুলনামূলক কিছু প্রসঙ্গে এখানে অবতারণা করা হল, তার থেকে চীনের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির বিস্ময়কর যে দক্ষতা তার সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ গভীরতর না হয়ে ওঠার যেমন প্রশ্ন ওঠে না, অন্য দিকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির যে বহুবিধ ভুল ভ্রান্তি আর পর্যাপ্ত যোগ্যতা অর্জনের ব্যর্থতার যে দিকগুলি তাকে ঢাকা দেওয়ার অপচেষ্টাও নিরর্থক। নিজেদের অযোগ্যতার ছাফাই গাওয়ার কোন ব্যাপারই নয়। প্রসঙ্গটা আত্মসমালোচনার নয় বলেই যে দিকটি স্বভাবতই আসেনি যা নিয়ে আলোচনা তা হলো হতাশা ও হতোদ্যম সম্পর্কের প্রসঙ্গে। আর বিনয়ের বিন্দুমাত্র অভাব না রেখেই এ কথা জোর দিয়ে দাবী করা চলে যে, আমাদের এ মাটি অনুর্বর নয়। যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি হয় সঠিক ধারায় সংগ্রামের মধ্য দিয়েই। আর এ দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস আগাগোড়া এবং পরিপূর্ণভাবে কোন এক ব্যর্থতার ইতিহাস নয়। বিপ্লবী আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি এখানে একেবারে ঐতিহ্যহীন বেওয়ারিশ নয়।

শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির কালো রাত্রির যুগ আজ অবসান হতে চলেছে; এমনকি সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ত অবশেষ ও আমলা মুৎসুদ্দি স্বার্থবিরোধী যে সংগ্রাম, জাতীয়

স্বাধীনতা প্রতিরক্ষার শ্লোগানেও যে সংগ্রাম, এর কোন কিছুই আজ আর শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার সংগ্রাম তথা শ্রেণীসংগ্রামকে পাশ কাটিয়ে অগ্রসর করার কোন অবস্থাই আর থাকছে না। আর এই শ্রেণীসংগ্রামের স্রোতে সম্পৃক্ত হলে, ঐক্য হয়ে উঠবে অপ্রতিরোধ্য। শুধু একটি মাত্র ক্ষেত্রে আজ সতর্কতা প্রয়োজন যাতে করে এই সব জীবন জীবিকার সংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রামগুলি বুর্জোয়া ধারার গর্তে না পড়তে পারে, যাতে এগুলি দলবিশেষের লেজুড়ে পরিণত করার ক্রিয়াকলাপেই পর্যবসিত না হয়, যাতে নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি না পেয়ে সংগ্রামী শ্রমজীবী মানুষের নিজেদের মধ্য থেকেই গড়ে উঠতে পারে তাদের নিজস্ব নেতৃত্ব। আর এইটুকু নিশ্চিত করতে পারলেই শ্রেণীসংগ্রামগুলি বিভক্ত থাকবে না, শ্রেণীসংগ্রাম সমস্ত বিপ্লবী শক্তিকে তার স্রোতের টানে ঐক্যবদ্ধ অবস্থানে নিয়ে আসবে। এই সম্ভাবনার আলোকচ্ছটায় এখনই দিগন্ত উদ্ভাসিত। এখন আর কোন হতাশা বা হতোদ্যমের কোন ক্ষমা মিলবে না। এ কাজে হাত লাগাবার সময় আমরা সংখ্যায় কতজন তার হিসাব করতে যাওয়া সমাজের গতিবিজ্ঞান সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞতা প্রকাশ করা। শ্রেণীসংগ্রামের কাজে লিপ্ত হওয়া এবং তাকে বুর্জোয়া ধারার খাদে পড়ার হাত থেকে মুক্ত রেখে শ্রমিকশ্রেণীর ধারায় নিয়ে যাওয়া এইটুকুই এখন শুরুতে দরকার। যত ক্ষীণতমই হোক না কেন এই স্রোত মুহূর্তে হয়ে উঠবে সর্বপ্লাবী। আর সব কিছু হতাশা এবং সংশয়ের বিরুদ্ধে নিরঙ্কুশবিজয় অর্জন করেই এগিয়ে আসতে হবে একাজে প্রথম হাত লাগাতে।

পরিশেষে এদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আর একটি সমস্যার আলোচনা করেই নিবন্ধ শেষ করতে চাই। সমাজতান্ত্রিক কর্মীদের একাংশের মনে প্রশ্ন আছে যে আমাদের মত দেশে, যেখানে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ভিতর ধর্ম-অনুভূতি অতিমাত্রায় প্রবল, সেখানে সমাজতান্ত্রিক পরিচিতি নিয়ে কাজ করা মুস্কিল। কমিউনিস্টরা ধর্মের শত্রু প্রভৃতি নানা ধরণের প্রচারণায় জনগণকে কমিউনিস্টদের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে রাখা হয়েছে, এরই ফলে কমিউনিস্ট পার্টির পাশে শ্রমজীবী মানুষকে জমায়েত করা প্রায় অসম্ভব।

বোধ হয় বাস্তবতার এই ধরনের এক বিশ্লেষণ থেকেই এদেশে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির প্রকাশ্য কাজ করার সুযোগ যখন থেকেছে, তখনও অনেকে প্রকাশ্যে কাজ করার পদক্ষেপ না নিয়ে অন্য কোন পার্টির আবরণে কাজ করবার পন্থা নিয়ে এসেছে। কিন্তু পন্থা যেটাই গ্রহণ করা হোক, বাস্তবতার এই ধরনের বিশ্লেষণ থেকে সমাজতান্ত্রিক কর্মীদের মধ্যে উদ্যম ও আস্থাবোধকে নিশ্চিতভাবে নিস্তেজ করে তোলে। জনগণের উপর আস্থা ও নির্ভর করার দিকটিকে দুর্বল করে দেয়।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক কর্মীদের পরিষ্কার থাকতে হবে যে, কোন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া যেসব শ্রমজীবী মানুষ শ্রেণীসচেতন হয়ে ওঠেন নি, তারা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে সমবেত হবেন না। এই অবস্থাটি কি এদেশে, কি অন্য দেশে সব ক্ষেত্রেই। শ্রমজীবী মানুষরা যে বিপ্লব করবেন, তবে অন্য দেশে সব ক্ষেত্রেই। শ্রমজীবী

মানুষরা যে বিপ্লব করবেন, তবে নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকেই দিতে হবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির পতাকাতলে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষদের জমায়েত করা সফল বিপ্লবের পূর্বশর্ত। ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষকে বিপ্লবী সংগ্রামে সমাবেশ করার সংগঠন হচ্ছে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীসংগঠন এবং গণসংগঠন। ব্যাপক জনগণকে তাদের জীবন-জীবিকার শ্রেণীসংগ্রামে সংগঠিত করার কাজই বিপ্লবী কর্মীদের প্রধান কাজ। আর এইসব শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণ যতই শ্রেণীসচেতন হয়ে উঠবেন, ততই তারা জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখতে থাকবেন যে কমিউনিস্টরাই তাদের জীবনসংগ্রামের সব চাইতে নির্ভরযোগ্য এবং কুশলী নেতৃত্ব দিতে পারে।

এদেশের শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে অতীতে একসময়ে একটি অভিজ্ঞতা ছিল যে কমিউনিস্টরা শ্রমজীবী মানুষের রুটি-রুজির সংগ্রামে নির্ভরযোগ্য সহযোগী। তখনও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ধর্মের নামে এবং জাতীয়তার নামে বিরুদ্ধ-প্রচার-অভিযান বেশী ছাড়া কম ছিল না। তৎসত্ত্বেও জনগণের রুটি-রুজির সংগ্রামের মধ্যে একনিষ্ঠভাবে লেগে পড়ে থাকার ফলেই কমিউনিস্টদের ঐ ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল।

তারপর কয়েক যুগ ধরে কমিউনিস্ট সাইনবোর্ড নিয়ে আমরা অনেকে অনেক ক্রিয়া কর্ম চালিয়েছি। কিন্তু জনগণের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সঠিক ধারায় শ্রেণীসংগ্রামের কাজ করিনি। অতীতের ঐতিহ্য আর ভাবমূর্তির সুযোগ গ্রহণ করেছি। গ্রহণ করে এমন ধরনের সব কাজ করেছি যাতে করে ঐ সব অতীত অতিহ্য ও ভাবমূর্তি তছনছ হয়ে যায়। যাতে করে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে জনগণের মনে বিভীষিকা আর বিতৃষ্ণার এক নতুন ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। আর এ ব্যাপারে আমরা অনেক দূর পর্যন্ত কামিয়াবও হয়েছি, তা অস্বীকার করার উপায় নেই এবং এই সবের সুযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জনগণের মনকে কমিউনিস্টদের প্রতি বিষিয়ে তুলবার অনুকূল সুযোগ কাজে লাগিয়ে চলেছে।

অবস্থার এই পর্যায়েও সমাজতান্ত্রিক কর্মীদের তাদের নিজস্ব অজেয় হাতিয়ারটি তুলে নেবার সম্বিত ফিরছে না; বরঞ্চ তাদের অনেকের মধ্যে এসেছে এক পরাজিতের মানসিকতা; পা বাড়াচ্ছেন এক ভয়াবহ সুবিধাবাদী পথে। কমিউনিস্ট পরিচয় লুকিয়ে পেটি বুর্জোয়া পার্টির ব্যানারে কাজ করতে হবে; ইসলাম পছন্দ দলগুলির চাইতেও আমরা বেশী ইসলামী এটা জাহির করার জন্য উঠেপড়ে লাগতে হবে; উগ্র জাতীয়তায় আর সকলকে টেক্কা মারতে হবে এবং এই সব পন্থায় জনগণের কাছে আস্থাভাজন হয়ে উঠবার চেষ্টা করতে হবে।

এই ধরনের সুবিধাবাদী পন্থায় কাজের ফলে যে প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের জমিনই উর্বর করে তোলা হয় এবং এই পন্থায় যে কখনই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজ এগোয় না, সমাজবিজ্ঞানের এই সহজ কথাটি তাদেরকে বুঝিয়ে দেবে।

এসব কিছু সত্ত্বেও, আজও যদি বামপন্থী কর্মীরা শ্রমজীবী জনগণের জীবন-জীবিকার শ্রেণীসংগ্রামের কাজে নির্ভীক অবস্থায় হাত লাগান, যদি দু'একটি ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামের স্রোতকে সৃষ্টি করতে পারেন, তবে দেখা যাবে শ্রেণীসংগ্রামের অতীত কমিউনিস্ট ঐতিহ্য মাটি ফুড়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে; মুহূর্তে দেখা যাবে, কঠিন জীবন-জীবিকার শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত জনগণ তাদের যুগ-যুগান্তের একান্ত আপন, আর সবচাইতে বিশ্বস্ত বন্ধু ও নেতার আসনে বরণ করে নিয়েছেন কমিউনিস্ট কর্মীদের।

শ্রেণীসংগ্রামের কাজে যে কর্মী হাত লাগাতে চলেছেন, সে কর্মী বে-ওয়ারিশ নন। এদেশের শ্রমজীবী মানুষের অতীত অভিজ্ঞতার মণিকোঠায় পাথরে-খোদা ঐতিহ্য রয়েছে। ঠিক বহু অনাচারের আবর্জনায় সে অতিহ্য চাপা পড়ে আছে। শ্রেণীসংগ্রামের স্রোতে ঐ আবর্জনাকে একটু সরিয়ে দিন। দেখবেন, ঐতিহ্যের এক অপরাজেয় বর্মের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছেন।

সমাপ্ত